# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা


## মাফিয়ানির্ভর রাজনীতির নগ্ন চেহারাই আবার গার্ডেনরিচে

গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র তোলাকে কেন্দ্র করে ছাত্র পরিষদ-তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সংঘর্ষ, সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুলিতে গার্ডেনরিচ থানার সাব-ইনস্পেক্টর তাপস চৌধুরীর মর্মান্তিক মৃত্যু, ঘটনার ৫২ ঘন্টা পর মুখ্যমন্ত্রীর 'সরাসরি' হস্তক্ষেপ, তড়িঘড়ি পুলিশ কমিশনারকে সরানো, ঘটনার তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাত থেকে সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়া, মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি— সমস্ত ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে বোঝা যাবে বিষয়টা অন্য পাঁচটা ঘটনার মতো নয়। এই ঘটনার গভীরে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতীরাজ ও তাদের ধারক-বাহকদের অশুভ আঁতাত এবং শাসকদলের নাম জড়িয়ে পড়ায় জনমতের চাপের সামনে দিশাহারা তৃণমূলের প্রশাসনিক 'অ্যাকশন'।

রাজ্যের মসনদে আসীন দলের বদল ঘটেছে, কিন্তু গার্ডেনরিচ আছে সেই তিমিরেই। ১৯৮৪ সালে সিপিএম সরকারের আমলে কলকাতা বন্দর এলাকায় দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তৎকালীন কলকাতা পুলিশের ডি সি (বন্দর) বিনোদ মেহতা। ঠিক ২৯ বছর পর ১২ ফেব্রুয়ারি সেই বন্দর এলাকাতেই দিনের আলোয় হাজারখানেক মানুষ এবং সংবাদমাধ্যমের অজস্র ক্যামেরার সামনেই দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর তাপস চৌধুরী।

*গার্ডেনরিচ কাণ্ডের প্রতিবাদে ডিএসও-র বিক্ষোভ (সংবাদ আটের পাতায়)*

বন্দর থাকার জন্য গার্ডেনরিচ এলাকা মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। এখানে চলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন, তোলাবাজি, চোরাচালান, বেআইনি অস্ত্র ও মাদক পাচারের রমরমা ব্যবসা। এ জন্যই এলাকায় মজুত রাখা হয় প্রচুর বেআইনি অস্ত্র।

তিনের পাতায় দেখুন

## পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির নিন্দা করল এস ইউ সি আই (সি)

পেট্রোপণ্যের দাম যথেচ্ছভাবে নির্ধারণ করার অধিকার দিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাতে গৃহস্থের জ্বালানির দাম বাড়ানোটাকে যেভাবে তেল কোম্পানিগুলির নিত্য অভ্যাসে পরিণত করেছে এবং তারা পুনরায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য নির্ধারণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দানবীয় তেল কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়ায়, তারা কাল্পনিক আন্ডার রিকভারিকে লোকসান হিসাবে দেখানোর কৌশলে দাম বাড়িয়েছে। এসব করার উদ্দেশ্য পেট্রোপণ্যের মূল্যের সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ করা, যা হলে কর্পদকশূন্য দেশবাসীকে তারা সম্পূর্ণ ছিবড়ে করে দেবে। আসন্ন বাজেটে ধনীদের জন্য সামান্য কিছু প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর ছলনায় মানুষকে প্রতারিত করার সাথে সাথে জ্বালানির দামের বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপর বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে দেবে সরকার। অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির তীব্র সংকটের বোঝাকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সরকার মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

উত্তরোত্তর সংকটের ফাঁস এবং আরও ভয়াবহ আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশজোড়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

## আফজল গুরুর ফাঁসি ও কিছু প্রশ্ন

৯ ফেব্রুয়ারি তিহার জেলে কাশ্মীরি যুবক আফজল গুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে নানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। মামলা সঠিক ছিল কি না, একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষে এতবড় অপারেশন চালানো সম্ভব কি না, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া সঙ্গত হয়েছে কি না ইত্যাদি বহু রকম প্রশ্ন নিয়েই দেশে বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক চলুক। কিন্তু যা নিয়ে কোনও বিতর্কই থাকতে পারে না তা হল, আফজল গুরুর মা স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্যদের প্রতি রাষ্ট্র ও সরকারের চরম অমানবিক তথা নিষ্ঠুর আচরণ। আফজলের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তার একটি ব্যাখ্যা সরকার দিয়েছে, কিন্তু তা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

পরিবারকে আইন মোতাবেক সময়মতো খবর দেওয়া, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে অন্তত একবার প্রিয়জনদের দেখা করতে দেওয়া ও মৃতদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগটুকু দিলে কি শক্তিধর ভারত রাষ্ট্র একেবারে ভেঙে পড়ত! এটা শুধু সরকারের মহানুভবতা প্রদর্শনের প্রশ্ন নয়, এর সাথে যুক্ত যে কোনও বন্দির মানবিক অধিকারের প্রশ্নও। আফজল গুরুর স্ত্রী তবাসুমও সরকারের কাছে ভারতের নাগরিক হিসাবেই তাঁর স্বামীর মৃতদেহটি অন্তত ফেরত চেয়েছেন। এ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উত্তরও অত্যন্ত অমানবিক। তিনি বলেছেন পরিবার আবেদন করলে তিনি আফজলের ব্যবহৃত জিনিসগুলি ফেরত দেওয়া ও জেলের মধ্যে সমাধি স্থান দেখতে দেওয়া হবে কি না তা ভেবে দেখবেন। একটি শোকসন্তপ্ত পরিবার যাদের প্রিয়জনকে সরকার সদ্য ফাঁসি দিয়েছে তাদের এটুকু আবেদনকেও কি সরকার সরাসরি মঞ্জুর করতে

চারের পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশের জনগণ আর এক ইতিহাস সৃষ্টি করছেন

স্বাধীনতাপন্থীদের হত্যা করেছিল যারা তাদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে ও তাদের মদতদাতা মৌলবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের জোয়ারে আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। ভারতে কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম তৃণমূলের মতো রাজনৈতিক দলগুলির নীতি-আদর্শহীন দেউলিয়া রাজনীতির সুযোগ নিয়ে যখন মৌলবাদী শক্তি আবার মাথা তুলতে চাইছে, তখন মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রাম নিঃসন্দেহে এ দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে প্রেরণার। কায়রোর তাহরির স্কোয়ারের মতোই ঢাকার শাহবাগ স্কোয়ার থেকে আজ শোনা যাচ্ছে বিদ্রোহের বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। আরব বসন্তের মতোই এ যেন বাংলা বসন্ত। যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি বেশি মানুষ যোগ দিচ্ছে আন্দোলনে। জনপ্রিয় শিল্পী, খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রগতিশীল লেখক, খেলোয়াড় সকলেই এসে মিলিত হয়েছেন শাহবাগ স্কোয়ারের জনসমুদ্রে। ৮ ফেব্রুয়ারি ইদানিংকালের বৃহত্তম সমাবেশ হয়েছিল শাহবাগে। শাহবাগের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের প্রান্তে-প্রত্যন্তে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের আদালত মৌলবাদী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির শীর্ষস্থানীয় নেতা গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত আবদুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। ১৯৭১-এর

চারের পাতায় দেখুন

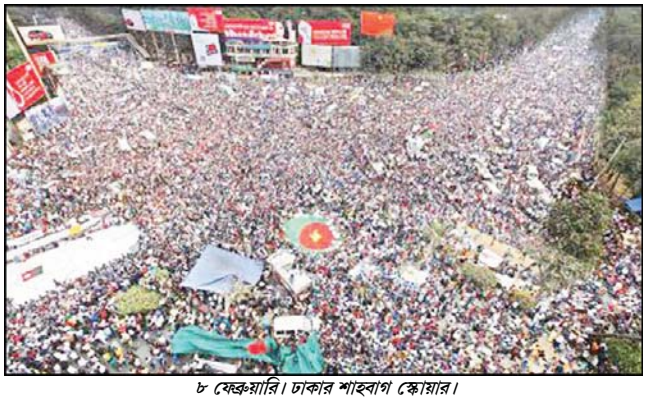

*৮ ফেব্রুয়ারি। ঢাকার শাহবাগ স্কোয়ার।*

## বালুরঘাটে ছাত্রীকে কটূক্তি, প্রতিবাদে এ আই এম এস এস

বালুরঘাট কলেজের আবাসিক ছাত্র হোস্টেল থেকে কটূক্তির শিকার হচ্ছিল নিকটবর্তী স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা। ৯ ফ্রেব্রুয়ারি এক ছাত্রী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারপরও চলতে থাকে কটূক্তি। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দা, দোকানদার ও পথচারীদের নিয়ে হোস্টেল সুপারের কাছে অভিযোগ জানান। সুপার অভিযুক্ত ছাত্রকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেন এবং অন্য আবাসিকদের সতর্ক করেন।

## বিদ্যুৎ ঃ রিজিওনাল অফিস ঘেরাও

কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ ও ভুতুড়ে বিল সংশোধন, লো-ভোল্টেজ ও লোডশেডিং বন্ধ, জমা দেওয়া সিকিউরিটির টাকা ফেরত ও বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর রিজিওনাল ম্যানেজারের অফিস অবরোধ করা হয়। নেতৃত্ব দেন সভাপতি মধুসূদন মান্না, সম্পাদক জগন্নাথ দাস, সহ-সভাপতি দুর্গাপদ নাগ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, প্রতি মাসে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এরই বিরুদ্ধে জেলার সর্বত্র চাষিরা বিক্ষোভে সামিল হচ্ছেন।

## বেতন বৈষম্য বন্ধের দাবি গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের

রাজ্য সরকারি বিভিন্ন অফিসে কর্মরত ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপার কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য বন্ধ করা, সকলের জন্য একই হারে নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত মাসিক বেতন, প্রতি মাসে নিয়মিত বেতন প্রদান এবং স্থায়ী সরকারি গ্রুপ ডি কর্মচারীর মর্যাদা সাপেক্ষে অন্তত ক্যাজুয়াল কর্মীদের মতো মাসিক ৬,৬০০ টাকা বেতন ও অন্যান্য দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গণডেপুটেশন দেয় সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার কর্মচারী সমন্বয় সমিতির পাঁচ শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন, সমিতির সম্পাদক বিমল জানা ও সভাপতি মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। (ছবি ৫ পাতায়)

## ধর্ষণকারীদের শাস্তির দাবিতে মৌন মিছিল ডায়মন্ডহারবারে

দিল্লির ধর্ষিতা ছাত্রী 'দামিনী'-র মৃত্যু সহ সারা দেশে এবং সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবারে ঘটে যাওয়া ছাত্রী ধর্ষণের সাথে যুক্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও কঠোরতম শাস্তির দাবিতে ১২ ফেব্রুয়ারি নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ডায়মন্ডহারবার শহরে এক মৌন মিছিল হয়।

## বর্ধমান জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

১০ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সি এম এস হাইস্কুলে। সম্মেলনে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমস্ত আউটস্ট্যান্ডিং এর টাকা এল পি এস সি মকুব করে কমপক্ষে ছয়টি কিস্তিতে পরিশোধ করা এবং বোরো চাষের মধ্যে লাইন না কাটার দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী বিদ্যুতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া এবং বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করে বিশ্ববাজারের সমান করার তীব্র বিরোধিতা করেন। দেড়শ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে হিমাদ্রী দে-কে সভাপতি ও সুব্রত বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ২১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

# সি এইচ জি কর্মীদের বিক্ষোভ

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত সি এইচ জি কর্মীরা ভয়াবহ বঞ্চনার শিকার। বহু আন্দোলনের ফলে কমিউনিটি হেল্‌থ গাইডস (সি এইচ জি)-দের মাসিক বেতন ৫০ টাকা থেকে বেড়ে মাত্র ৩০০ টাকা হয়েছে। বিগত '১১ সালে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে আরও ২৫০ টাকা বাড়ানোর কথা বলা হলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। ট্রেডদাইদের মাসিক বেতন ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩০০ টাকা ও পরে ৫৫০ টাকা হয়েছে, যদিও তা বাঁচার মতো মজুরি নয়। কিন্তু লিংকম্যান-মবিলাইজার-ভ্যাক্সিন ক্যারিয়ারদের বেতন মাসিক মাত্র ১০০ টাকা। কোনও মাসে ক্লিনিক ও কাজ অনুযায়ী ১০০ টাকার সামান্য বেশি জোটে। এইটুকু বেতনও প্রতি মাসে নিয়মিত দেওয়া হয় না। ৭/৮ মাস বা আরও বেশি সময় বকেয়া থাকে। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত সমস্ত কর্মচারীদের নিয়মিত সরকারি স্বাস্থ্য কর্মচারীর মর্যাদা সাপেক্ষে ক্যাজুয়াল কর্মীদের মতো অন্তত ৬,৬০০ টাকা মাসিক বেতন, ৬০ বছর বয়সে অবসর দিলে অবসরকালীন সময়ে ১ লক্ষ টাকা এবং পেনশন বা বার্ধক্য ভাতা হিসাবে প্রতি মাসে অন্তত ২,০০০ টাকার দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিউনিটি হেলথ গাইডস ইউনিয়ন ৫ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যভবনে বিক্ষোভ দেখায় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট গণডেপুটেশন দেয়।

# প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার চাষি-আন্দোলনের প্রবীণ কর্মী কমরেড খগেন মণ্ডল গত ১০ জানুয়ারি নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবরে দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মরদেহ জঙ্গীপুর লোকাল কমিটির অফিসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে জঙ্গীপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মির্জা নাসিরুদ্দিন, পূর্বতন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনুরাধা মণ্ডল সহ দলের কর্মী সংগঠকরা তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড মণ্ডল ১৯৬৭ সালের শেষে এস ইউ সি আই (সি) পরিচালিত বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের প্রবল সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর আগের কয়েক মাস অসুস্থতার সময় বাদ দিলে দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। বর্গাচাষি এই কমরেড কখনও চাওয়া পাওয়ার প্রলোভনের শিকার হননি। লেখাপড়া না জানার কারণে ছাত্র-যুবকদের দিয়ে গণদাবী নিয়মিত পড়িয়ে শুনতেন। ২২ জানুয়ারি রঘুনাথগঞ্জ ইয়ুথ ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর সহযোদ্ধা কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সভাপতিত্বে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিবাজী সরকারও বক্তব্য রাখেন।

**কমরেড খগেন মণ্ডল লাল সেলাম**

# স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে গ্রামীণ চিকিৎসকদের সম্মেলন

গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সেই গ্রামীণ চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে স্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা এবং এন আর এইচ এম-এর মাধ্যমে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাণিজ্যিকরণ বন্ধের দাবি জানালেন। ১১ ফেব্রুয়ারি প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্মেলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে প্রায় ৩ হাজার গ্রামীণ চিকিৎসক কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যায়। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্কর ভদ্রের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। কলেজ স্কোয়ারের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অশোক সামন্ত, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা প্রমুখ।

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে ৪ শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংগঠনের পঞ্চম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডাঃ অশোক সামন্ত। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা সিস্টার প্রীতি তারণ প্রমুখ। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি থেকে আসা আদিবাসী মহিলা প্রতিনিধি লতিকা সিং সর্দার তুলে ধরেন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের কীভাবে লড়তে হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় শেষ পর্যন্ত কীভাবে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে প্রসব করাতে হয়। সরকার মুখে যা বলে, গ্রামের মানুষ সেইসব সুবিধার ছিটেফোঁটাও পায় না। তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তব্য সকলকে নাড়িয়ে দেয়। বহু প্রতিনিধি তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, সাপে কাটা ও কুকুর কামড়ানোর প্রতিষেধক সহ সমস্ত ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ এবং সমস্ত গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবি জানান তাঁরা। সম্মেলন থেকে ডাঃ ভাস্কর ভদ্রকে সভাপতি ও ডাঃ প্রাণতোষ মাইতিকে সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করে ২২ জনের এক্সিকিউটিভ কমিটি সহ সংগঠনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

# ব্যারাকপুরে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

৭ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স প্রদান এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মিছিলের আয়োজন করা হয়। সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালক ব্যারাকপুরে স্টেশন চত্বরে জমায়েত হন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী, জেলা সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা এবং জেলা সভাপতি প্রবীর চৌধুরী। বক্তারা মোটরভ্যান চালক শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখেন ও ২০-২১ ফেব্রুয়ারির সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান।

# জমি পেলেও শিল্প হচ্ছে না কেন

জমি ফেলে রেখেছে রিলায়েন্স। পারছে না কোনও শিল্প গড়তে। এক আধ বছর নয়, পাঁচ বছর হয়ে গেল। অনিল ধীরুভাই আম্বানি গোষ্ঠীকে সিপিএম সরকার ২০০৮ সালে জমি দিয়েছিল। কল্যাণীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত, পরিকাঠামোর কোনও অভাব নেই, চাইলেই শিল্প গড়া যায়, সেখানেও তারা ৫০ একর জমি ফেলে রেখে দিয়েছে।

আম্বানি গোষ্ঠী এই জমিতে কী শিল্প গড়তে চেয়েছিল? যা তারা পারল না? তারা জমি নিয়েছিল বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য। অর্থাৎ কোনও কারখানা নয়, যেখানে জিনিস উৎপাদন হবে। কর্মসংস্থান হবে। অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। তারা জমি নিয়ে কারখানার বদলে শিক্ষা ব্যবসা করতে চেয়েছিল। শিক্ষাও এখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। পরিষেবা নয়। বেসরকারি মালিকদের জায়গা করে দিতে সরকার শিক্ষার সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে। আর শিল্পমালিকরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষাব্যবসাতে লোভের হাত বাড়াচ্ছে। শিক্ষা ব্যবসাকে এখন শিল্পের তকমা দেওয়া হচ্ছে। মালিকরা এই শিল্পে পুঁজি ঢালবে, রিটার্নও হবে চমৎকার। মজুর নিয়ে কোনও অশান্তিও পোহাতে হবে না। পুঁজি খাটানোর জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সরকার। একইভাবে স্বাস্থ্য শিল্প, আবাসন শিল্প গড়ে উঠছে। কল কারখানা গড়ার পরিবর্তে এই সব শিল্পের জয়গান গাইছে শিল্পপতিরা।

এই সব শিল্প স্থাপনের জন্য জমি চাই এই বলে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা আদার ব্যাপারীরা গালে হাত দিয়ে ভাবছি, তাই তো, জমি না হলে শিল্প গড়বে কী করে মালিকরা, শিল্প তো আকাশে হয় না। আর আমাদের চাকরি জোটানোর জন্যই নাকি শিল্প শিল্প বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে মালিক আর তাদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যম। প্রতিদিন নিয়ম করে আদা জল খেয়ে টিভি, রেডিও খবরের কাগজে বলা হচ্ছে জমি ব্যাঙ্ক চিহ্নিত করতে হবে, জমি নীতি পরিষ্কার করতে হবে। শিল্পপতিরা জমি না পেয়ে হতাশ হয়ে দেশান্তরী হচ্ছে। আফ্রিকায় গিয়ে সব জমি কিনছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যারা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা কিনবে তাদের উদ্দেশ্য বিরাট মাইনের একটা চাকরি জোটানো। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে তথ্য প্রযুক্তির বাজার নেই, চাকরিও নেই। তাই আম্বানি মহোদয়ের পরিকল্পনা বাতিল। তাদের শিক্ষা-পণ্যের কাটতি নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়মে শিক্ষা-শিল্প তাই করা গেল না আম্বানিদের।

কিন্তু পুঁজিবাদের স্তাবকরা বলতে শুরু করে দিয়েছে, শিল্প না গড়তে পারলেও জমি ফেরত নেওয়া যাবে না রিলায়েন্সের কাছ থেকে। কোন ভবিষ্যতে তারা শিল্প গড়তে পারবে তার জন্য তাদের জমি রেখে দিতে হবে। সে শিল্প শিক্ষা-ব্যবসা না হোক, স্বাস্থ্য-শিল্পও হতে পারে, তাও না পারলে আবাসন-শিল্প হতে পারে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের ৩৫০০০ কোটি টাকার ইস্পাত শিল্পের জন্য জমি পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। ২০০৭ সালে জমি পেলেও এতদিন হয়ে গেল ইস্পাত শিল্পের জমি ফাঁকাই পড়ে থাকল। সরকারের কাছ থেকে সব রকমের সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কেন ইস্পাত শিল্প গড়তে পারল না জিন্দালদের মতো বিশাল শিল্পপতি? পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে শ্যাম স্টিল, জয় বালাজি গোষ্ঠীর কারখানা, ডিভিসি-র বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি তো পড়েই আছে, কিন্তু শিল্প অধরা। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

জমি পাওয়ার কোনও সমস্যা না থাকলেই কি আজ কল-কারখানার বান ডাকবে দেশে? তা আর হতে পারে না। প্রতিনিয়ত ভয়াবহ মন্দার জন্ম দিচ্ছে এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। শ্রমিককে শোষণ করেই আসে মালিকের মুনাফা— মূল এই নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। শোষণে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে মালিক। ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী কিনতে পারে না শ্রমিক। বাজারে বাড়তি উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়। কারখানার মাল মজুত হয়ে থাকে। ফলে উৎপাদন কমাতে থাকে মালিক। কিছু কারখানা বন্ধ করে দেয়। বেকার বাহিনী বাড়তে থাকে। বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়। মন্দা বাড়তে থাকে। বাজার সঙ্কোচন, বেকারি, মন্দার এই চক্র থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি কখনই বেরোতে পারে না। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে যে শিল্পবিপ্লব তারা করেছিল, তাও আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

যতটুকু শিল্প এখন গড়ে উঠবে তাও হবে পুঁজিনিবিড়। বিশাল পরিমাণে লগ্নি হলেও শ্রমিকের কর্মসংস্থান প্রায় কিছুই হয় না। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা জানাচ্ছে, সংগঠিত শিল্পে কারখানার সংখ্যা ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল, এই পঁচিশ বছরে দুই গুণেরও বেশি অর্থাৎ ১০০ শতাংশের বেশি হয়েছিল। অথচ সেখানে শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছিল মোটে ৪ শতাংশ।

জমির জন্য যারা কেঁদে মরছে তাদের আসল উদ্দেশ্য জমি ব্যবসা। শিল্প নয়।

# মাফিয়ানির্ভর রাজনীতির নগ্ন চেহারাই গার্ডেনরিচে

একের পাতার পর

বেআইনি কারবার টিকিয়ে রাখতে এই দুষ্কৃতীরা আশ্রয় নেয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে, আর দলের তহবিল ভরানো এবং ভোটে জেতানোর শর্তে দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেয় ক্ষমতার রাজনীতির কারবারিরা। এলাকার কয়েকশো যুবক এই প্রক্রিয়ায় দুষ্কৃতকর্মে লিপ্ত। দিনের বেলাতেও রিভলবার, নাইন এম এম, সেভেন এম এম পিস্তল নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় এদের, কিন্তু শুধু পুলিশই দেখতে পায় না। সেখানেও থানার সাথে, এমনকী আরও উপরওলার সাথে বন্দোবস্ত করা থাকে। সব নির্বাচনেই এদের প্রকাশ্য দাপাদাপি এই শহরে একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। কেউ যদি কখনও ধরা পড়েও যায়, কিছু দিনের মধ্যেই ছাড়াও পায় সে।

মূল পাণ্ডাদের বাদ দিয়ে অভিযোগের তির যাদের বিরুদ্ধে দাগা হচ্ছে সেই শেখ সুহান, ইবনা সাইদ, আব্দুস শুভম— এরা কারা? এরা সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা মূল দুষ্কৃতীদের সাকরেদ। আজ যে সিপিএম তৃণমূল-মাফিয়া আঁতাতের বিরুদ্ধে রব তুলছে, সেই সিপিএমের রেকর্ড ভিন্ন কিছু নয়। ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, গার্ডেনরিচের বিবদমান দুই নেতা মহম্মদ ইকবাল ও মোক্তার আহমেদ উভয়ই একসময় সিপিএমের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। রাজ্যে ক্ষমতার বদলের পর যথারীতি এরা তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের ছাতার তলায় চলে আসে। বন্দর এলাকার ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ থেকে শুরু করে মাল ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ সহ নানা বেআইনি ব্যবসা, তোলাবাজি মূলত ইকবালের হাতের মুঠোয়। ইকবালের হাতেই দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণ, ফলে ইকবাল যেদিকে ঢলবে ভোটও সেদিকে। একসময় যে ইকবাল সিপিএমের ভোট করাত, সেই ২০০৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে ভোট করিয়েছে, আবার ২০১১-র বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীর জেতার তাসও তার হাতে ছিল বলে জানা গেছে।

২৯ বছর আগে ১৯৮৪ সালে ঐ এলাকাতেই দুষ্কৃতীদের হাতে ডি সি (বন্দর) বিনোদ মেহতা খুন হওয়ার পর দুষ্কৃতী ধ্বংসে আজকের মুখ্যমন্ত্রীর মতোই কামান দাগতে দেখা গিয়েছিল তৎকালীন সিপিএম সরকারকে। কিছু চুনোপুঁটি ধরা পড়লেও কেষ্টবিষ্টুরা ছিল জেলের বাইরেই। ঐ হত্যার তথ্যসূত্র দিতে পারে এমন একজন মহম্মদ ইদ্রিসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কঠোর নিরাপত্তায় তাকে আটকে রেখে সরকার ও পুলিশ দাবি করেছিল, ইদ্রিসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিনোদ মেহতার হত্যাকারীকে ধরা হবে। হঠাৎ একদিন জানা গেল লালবাজারের কঠিন ঘেরাটোপের মধ্যেই ইদ্রিস নাকি তিনতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'আত্মহত্যা' করেছে। অভিযোগ, মূল হোতাদের নাগালের বাইরে রাখতে তৎকালীন শাসকদলের আজ্ঞাবহ পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল ইদ্রিসকে। পুলিশ অফিসার বিনোদ মেহতার খুনিরা বহাল তবিয়তেই থেকে গেল, ধরা হল না তাদের। শাসক দল, দুষ্কৃতী ও পুলিশের বোঝাপড়ার সেই পরম্পরা আজও অব্যাহত। গার্ডেনরিচের ঘটনার দিন গুলি চালানোর অভিযোগে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতী শেখ সুহানকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ধরেছিল। কিন্তু পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ঘটনায় অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবাল ওরফে মুন্নার নির্দেশে, সুহানকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবাল এবং পূর্বতন সিপিএম ও বর্তমানে কংগ্রেসের নেতা মোক্তার আহমেদের নাম বারবার সামনে এলেও এবং ঘটনার পর দু'দিন ধরে এদের প্রকাশ্যে টিভি চ্যানেলে ও এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলেও পুলিশ তাদের 'খুঁজে' পাচ্ছে না। শুধু কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে অপসারণ করার দ্বারাই যে তাপস চৌধুরীর হত্যাকারীরা ধরা পড়বে না, এ কথা পুলিশ কর্মীরাও জানেন। ওটা নির্ভর করবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর, দুষ্কৃতীনির্ভর শাসকদল ওপথে যাবে কি না তার উপর।

হরিমোহন ঘোষ কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন দখল মূল কথা নয়, এ হচ্ছে বন্দর এলাকায় কোন মাফিয়ার (পড়ুন কোন দলের মাফিয়ার) কর্তৃত্ব খাটবে, তা প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশমাত্র। যদিও শুধু ছাত্র ইউনিয়ন দখলের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও ছবি অন্যরকম নয়। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারে কংগ্রেস বসার পর সব শ্রমিক ইউনিয়ন, সব ছাত্র ইউনিয়ন, সকল রকমের কমিটিতে কংগ্রেসের পতাকা ওড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেজন্য হুমকি, হামলা, খুন কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। ১৯৭৭ সালে সিপিএম সরকারে বসার পর একই পরম্পরায় শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে সকল কমিটি, পঞ্চায়েত এলাকা যার সর্বত্র সকল স্তরে সিপিএমের কবজা কায়েমের পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু হল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী সংগঠনের ছাত্রছাত্রীদের মেরে, পরিবারকে হুমকি দিয়ে, ছাত্রজীবনের সুযোগসুবিধা, চাকরির লোভ দেখিয়ে ও আরও নানা উপায়ে ইউনিয়ন দখল করা হল— এস এফ আই-এর পতাকা ওড়াতে বাধ্য করা হল। তৃণমূল ক্ষমতায় বসার পর ঠিক সেই জিনিসই প্রায় নকল করে চলছে বলা যায়। কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন টিএমসিপি-র হাতে, যদি দেখা যায়, বিরোধী সংগঠন নির্বাচনে লড়ার সুযোগ পেলে অসুবিধা, তখন মনোনয়নপত্র তোলার দিনই কলেজের তৃণমূল সমর্থক ছাত্রদের হয়ে এলাকার সমাজবিরোধীদের (যারা ইতিমধ্যেই সিপিএম শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে) জড়ো করে হামলা চালিয়ে বিরোধী সংগঠনের ছাত্রদের মনোনয়নপত্র তুলতে বা জমা দিতেই দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ কলকাতার পি জি মেডিকেল কলেজ ও যোগমায়া দেবী কলেজে অন্যপন্থা নেওয়া হয়েছে। এই দুটি কলেজেই ডি এস ও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনা করে। ভিতরে তৃণমূলের পক্ষে দাঁড়াবার মতো ভালো সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যেহেতু তৃণমূল পায়নি, ফলে বাইরে থেকে সংগঠিত হামলা-আক্রমণ চালিয়েও তৃণমূল ইউনিয়ন দখল করতে পারবে না জেনে মন্ত্রী কলেজ কর্তৃপক্ষকে টেলিফোনে হুমকি দিয়ে নির্বাচনই বন্ধ করে দিয়েছেন। শাসক দলের হুমকি তথা নির্দেশ অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই কলেজ কর্তৃপক্ষের। ফলে, যতদিন না তৃণমূল ছাত্রপরিষদ ঐ দুই কলেজে 'ইউনিয়ন দখল' করার 'শক্তি অর্জন করছে, ততদিন ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন হবে না'। ফলে, শুধু গার্ডেনরিচই নয়, সর্বত্রই কংগ্রেস, সিপিএমের গুণ্ডারাজের পরম্পরাই চলছে তৃণমূল শাসনে।

সিপিএম শাসনও শুরুতে এ রাজ্যের বহু মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, পরবর্তীকালে তা চুরমার হয়ে গেছে। তৃণমূল মাত্র ২০ মাস সরকারে থেকেই মানুষের প্রত্যাশায় জল ঢেলে দিচ্ছে। কুকর্মের যেন প্রতিযোগিতা চলছে। সিপিএম কুকর্ম করত সংগঠিতভাবে, তা ব্যাপক জনচক্ষু থেকে আড়ালে রাখার দক্ষতা ছিল তাদের। কিন্তু তৃণমূলের সেই সংগঠন ও দক্ষতা নেই, ফলে সবটাই নগ্ন হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কেন এমন হল? সিপিএম ও তৃণমূল উভয় দলের নেতৃত্বই নিশ্চয় নির্বোধ নন। তারা এসব দুষ্কর্ম ও কুকীর্তি চাপাও দিতে চান, কিন্তু পারেন না। বসন্তের গুটির মতো সর্বাঙ্গে তা ফুটে বেরোয়, সিপিএমের ক্ষেত্রে তা বেশি সময় নিয়েছে, তৃণমূলের অতি অল্প সময় লাগছে। এর কারণ রয়েছে উভয়ের রাজনীতির চরিত্রের মধ্যে। সিপিএম কোনওকালেই মার্কসবাদী ছিল না, কিন্তু বামপন্থা তাদের মধ্যে ছিল। সরকারে বসে ক্ষমতা ধরে রাখার একমাত্র লক্ষ্য পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের সেবায় তারা যত নিবেদিত হয়েছে, ততই বামপন্থা থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। শেষমেষ সিপিএম অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতোই একটি নীতিহীন-আদর্শহীন ক্ষমতালিপ্সু দলে পরিণত হয়েছে, যার প্রকাশ বসন্তের গুটির মতো দলের সর্বাঙ্গে ফুটে বেরিয়েছে। আজও সিপিএম নেতাদের আচার-আচরণ বিচার করলেই দেখা যাবে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য বা রাজনীতি হচ্ছে, আবার রাইটার্সের চেয়ারে বসার সুযোগ পাওয়া। আর তৃণমূল কংগ্রেস তো আগাগোড়াই একটি আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল। সিপিএমের অত্যাচারী জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে তৃণমূল আন্দোলনে এসেছিল সরকারি ক্ষমতা দখল করার সুযোগ সৃষ্টি করতেই (সিপিএম-ও একই লক্ষ্য নিয়ে একসময় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।) সিপিএম যেমন সরকারে বসে দলের সৎ আদর্শবান কর্মীদের ভুলেছে, খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের কথা মনে রাখেনি, তৃণমূল কংগ্রেসও সরকারে বসার পর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গরিব চাষি-মজুরদের কথা, শহিদদের কথা, আন্দোলনকারী সৎ কর্মীদের কথা বিস্মৃত হয়েছে। অর্থাৎ নীতি-আদর্শ নয়, সংস্কৃতি নয়, এদের একমাত্র মন্ত্র ক্ষমতা— যে কোনও উপায়েই হোক, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-অর্থবল চাই। শ্রেণি বিভক্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই রাজনীতি যেমন মালিক শ্রেণি ও ধনকুবেরদের পক্ষপুটে দলকে ঠেলে দেবে, তেমনই যাবতীয় দুষ্কর্মের নায়ক ও শরিক করে ফেলবে দলের নেতা-কর্মীদের। এটাই তাদের নির্ধারিত পরিণতি। বুর্জোয়া রাজনীতির এই পরিণতি অনিবার্য।

ফলে যে ইকবাল, মোক্তাররা একসময় সিপিএমের পতাকা তুলেছে, আজ তারাই কংগ্রেস-তৃণমূলের পতাকা তুলছে। এভাবেই ক্ষমতার রাজনীতি দুষ্কৃতীদের বাঁচিয়ে রাখে, দুষ্কৃতীরাও বাঁচিয়ে রাখে ক্ষমতার রাজনীতির কারবারিদের। এর অবসান ঘটাতে হলে জনগণকে নীতিভিত্তিক-আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

# আফজল গুরুর ফাঁসি ও কিছু প্রশ্ন

একের পাতার পর

পারত না?

সংসদ হামলায় আফজলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে। বিচারপর্ব শুরুর সময় থেকেই 'অপরাধী' ঘোষণা করে দেওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রেও কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথম পর্বের বিচারে আফজলের পক্ষে আদালতে নামী-দামী আইনজীবীরা কেউ লড়তে চাননি। ফলে সর্বোচ্চ আইনি সহায়তা তিনি পাননি। পুলিশ যতজনকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। অন্যজনের দায়রা আদালতে মৃত্যুদণ্ডের রায় হলেও দিল্লি হাইকোর্টে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। সংসদ ভবনে হামলার মতো ঘটনা মাত্র একজনের পক্ষেই ঘটানো সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন ওঠাটা কি খুব অস্বাভাবিক? আরও প্রশ্ন থেকে গেছে। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদ ভবনে হামলার সময় হামলাকারীরা এসেছিল গাড়িতে লাল বাতি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের স্টিকার লাগিয়ে। তা কী করে সম্ভব হয়েছিল? গোয়েন্দারা ন্যূনতম কোনও আঁচও পেল না, অথচ রাজধানীর বুকে এমন ঘটনা ঘটে গেল কী করে! সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা অফিসার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসারদের বিরুদ্ধে এর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তা তো দেশের মানুষের জানা উচিত! সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে পরিবারের প্রতি আচরণ নিয়ে। আফজলের পরিবারকে ফাঁসির খবর দেওয়া হল স্পিড পোস্টে, যা গিয়ে পৌঁছাল ফাঁসির দু'দিন পর। আজকের দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে যা রীতিমতো হাস্যকর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পরিবারকে আগে খবর দিলে সে খবর ছড়িয়ে যেত, ফলে মানুষ বিক্ষুব্ধ হত। তাই কোনও খবর দেওয়া হয়নি। মানুষের বিক্ষোভ কিন্তু বেড়েছে এই গোপনীয়তাকে ঘিরেই। কাশ্মীরের মানুষের সামনে সরকারের কোন মুখটি ফুটে উঠল? তাঁরা দেখলেন দেশের সরকার তাঁদের ন্যূনতম বিশ্বাস করে না। এমনকী দিল্লির বিশিষ্ট সাংবাদিক ইফতিকার গিলানি ও তাঁর স্ত্রীকে ৯ ডিসেম্বর পুলিশ আটক করে পাঁচ ঘন্টা বসিয়ে রাখে, তাঁদের দুই স্কুল পড়ুয়া সন্তানকেও সারাদিন শোওয়ার ঘরে তালাবন্ধ করে আটকে রাখে পুলিশ। প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মার্কণ্ডেয় কাটজু দোষী পুলিশদের শাস্তি দাবি করলেও সরকার কিছুই করেনি। ইফতিকারের একমাত্র অপরাধ তিনি কাশ্মীরি ও হুরিয়ত কনফারেন্স নেতা গিলানির জামাই। কোনও 'অভিযুক্ত' ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেই কি তিনি অপরাধী হয়ে যান? এ কীসের গণতন্ত্র? এ তো চরম স্বৈরাচার!

আফজল গুরুর জীবনও এই কথাকে সমর্থন জানায়। আফজল ছিলেন এম বি বি এস-এর মেধাবী ছাত্র। কাশ্মীরের পরিস্থিতি তাঁকে ঠেলে দেয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানপন্থী উগ্র সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তিনি বিএসএফ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছিলেন আফজল। পূর্বতন জঙ্গি হওয়ার অপরাধে সেনাবাহিনী এবং বিএসএফ-এর কিছু অফিসার ঘুষ চেয়ে তাঁর ওপর বারবার অকথ্য অত্যাচার চালায়। আফজল ও তাঁর স্ত্রী নিজেদের সর্বস্ব বেচেও তাদের খাঁই মেটাতে পারেননি। ২০০৪ সালের ২১ অক্টোবর আফজলের স্ত্রী তবাসুম কাশ্মীর টাইমসের সাংবাদিকের কাছে এর মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন। তিনি যে সমস্ত সেনা ও বিএসএফ অফিসারের নাম করে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাদের কোনও শাস্তিই হয়নি। আফজল গুরু নিজেও সংসদ হামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর তদন্তকারীদের কাছে এবং ২০০৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে এক সেনা অফিসার তাঁকে কীভাবে দিল্লিতে মহম্মদ নামে এক ব্যক্তির জন্য বাড়ি ভাড়া করে দিতে বাধ্য করে। না হলে তাঁর পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এর পর তাঁকে বলা হয় কাশ্মীরে ফিরে যেতে। ইতিমধ্যে সংসদ ভবনে হামলার ঘটনা ঘটে। মহম্মদ নামের ব্যক্তির কেনা গাড়িই সংসদ হামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল। পুলিশ কাশ্মীর থেকেই আফজলকে গ্রেপ্তার করে। আফজলের অভিযোগ ছিল ঐ ব্যক্তিটি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের নাম এবং তাদের সম্পর্কে সবিস্তার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ হুমকি দেয় — এ কথা আদালতে বা সাংবাদিকদের বললে তাঁর পরিবারের সকলকে খুন করা হবে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ ফেব্রুয়ারি '১৩)। এই গুরুতর অভিযোগের কোনও উত্তর কিন্তু দেশবাসীকে জানানো হয়নি।

মূল ধারার সংবাদমাধ্যমই প্রশ্ন তুলেছে, ৮ বছর ঝুলে থাকার পর হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে আকস্মিক এত তাড়াহুড়ো এবং নাটকীয় গোপনীয়তায় আফজলের ফাঁসি কার্যকর করতে হল? তারাই উত্তর দিয়েছে, ভোট বড় বালাই। মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারি, আর্থিক মন্দা, নারী নির্যাতন বৃদ্ধি, শিল্পোৎপাদন তলানিতে। এ সবের ধাক্কা সামলাতে কংগ্রেস সরকার দিশাহারা। তাদের সংসদীয় বিকল্প বিজেপিও জানে এই বাজারে কোনও আর্থিক সুখস্বপ্নের স্লোগানই আর চিঁড়ে ভেজাতে পারবে না। কংগ্রেসের চুরি-দুর্নীতির দিকেও তারা আঙুল তুলতে পারবে না। কারণ, দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপির সভাপতি পাল্টাতে হয়েছে। মানুষ জেনে গেছে, বিজেপিও দুর্নীতির আখড়া। তাই বিজেপি-আরএসএস আবার উগ্র হিন্দুত্ববাদের নেশায় মত্ত করতে চাইছে দেশের ভোটারদের। এ কারণে তারা সামনে আনছে নরেন্দ্র মোদীর নাম। মোদীর অতি বড় স্তাবকও জানে গুজরাটের উন্নয়ন পুরুষ বলে শত ঢাক পেটালেও মোদীর একটিই পরিচয় জনমানসে খোদিত, তিনি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পোস্টারবয়, সংখ্যালঘু গণহত্যার প্রতীক। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষের বিষভাণ্ড আবার নতুন করে খুলতে চায় বিজেপি। কংগ্রেস এখানেই দিশেহারা। কারণ বিকল্প শুভ কিছু দেওয়ার ক্ষমতা এই দলটির নেই। ফলে একদা রাজীব গান্ধী যেমন অযোধ্যার বাবরি মসজিদের ভিতরে মন্দির স্থাপনের শিলান্যাস করে নিজেকে 'হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী' প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, এবার হঠাৎ আফজল গুরুর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করে কংগ্রেস বিজেপির সাথে হিন্দুত্ববাদের প্রতিযোগিতায় নামার পরিকল্পনা করেছে। সেজন্য একজন মানুষকে (অপরাধী হলেও) এ ভাবে চরম গোপনীয়তায় পরিবারকে জানতে না দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে! এ তো নিতান্তই বর্বরতা!

# বাংলাদেশের জনগণ আর এক ইতিহাস সৃষ্টি করছেন

একের পাতার পর

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কাদের মোল্লা ঢাকার মীরপুর এলাকায় 'রাজাকার' বাহিনী গড়ে তুলে স্বাধীনতাপন্থী ছাত্র, আইনজীবী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুঠ ও ধর্ষণ চালিয়েছিল। দলবল নিয়ে একটি গ্রামে হানা দিয়ে ৩৪৪ জনকে খুন করার দায়েও দোষী সাব্যস্ত এই কাদের মোল্লা। স্বাভাবিকভাবেই 'মীরপুরের কসাই' নামে কুখ্যাত এই অপরাধীর প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে কারাদণ্ডের ঘোষণায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ছাত্র বুদ্ধি জীবী আইনজীবী ও নানা পেশার নাগরিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন। তাঁদের দাবি, মানবতার বিরুদ্ধে এই অপরাধীর ফাঁসি দিতে হবে। ফাঁসি দিতে হবে গোলাম আজম, দেলোয়ার হোসেন সাইদি, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সহ সকল যুদ্ধাপরাধী জামাতের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের।

বাংলাদেশের এই গণআন্দোলন বহু দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের ডাক কোনও রাজনৈতিক দল দেয়নি। চার দশক ধরে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণ-প্রতারণা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্ষোভই বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়েছে শাহবাগ ময়দানে। স্বাধীনতার চার দশক পরেও বাংলাদেশের ছাত্রযুবদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গণতান্ত্রিক চেতনা যে আজও জাগরূক এই আন্দোলন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই তরুণ— যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, জন্মেছে তার পরে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার সমস্ত ফল ভারতের মতো সে দেশেও আত্মসাৎ করেছে বুর্জোয়া শ্রেণি। এক শোষণহীন, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ সংবিধানে থাকলেও সে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি ধীরে ধীরে নীতি-আদর্শহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত, অধঃপতিত দ্বিদলীয় শাসন কায়েম করে অবাধ লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের উপর শোষণ-বঞ্চন না মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আওয়ামি লিগ ও বিএনপির মতো শাসক দলগুলি মৌলবাদের সাথে আপসের ফলে জামাতের মতো উগ্র মৌলবাদী সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে ধর্মীয় জিগির তৈরি করে শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনকে বিপথগামী করে তুলছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সাম্প্রদায়িক শক্তির রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সংবিধানে। ১৯৭৯ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে তা তুলে নেওয়া হয়। ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই সংশোধনী বাতিল করে দেয়। ফলে সুযোগ সৃষ্টি হয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার। কিন্তু আজও তা করা হয়নি। আজও সংবিধানের মাথায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কথাটি বহাল রাখা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মৌলবাদবিরোধী এই আন্দোলনের তাৎপর্য বিরাট।

অতীতের পাকিস্তানি শাসকদের সহযোগী মৌলবাদী জামাত বর্তমানে বি এন পি জোট শরিক। ১৯৯২ সালে তৎকালীন শাসক দল বিএনপি জামাত-নেতা গোলাম আজমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়। এর বিরুদ্ধে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে '৭১-এর ঘাতক দালাল বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক গণআদালত গঠন করে গোলাম আজম সহ যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। অন্য দিকে আওয়ামি লিগ ১৯৯৬ সালে জামাতের সঙ্গে জোট গড়ে ক্ষমতায় বসে। ফলে তারাও যুদ্ধাপরাধের বিচার করেনি। দেশজুড়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সোচ্চার হলে বর্তমান শাসক আওয়ামি লিগ ২০০৮ সালে তার নির্বাচনী ইস্তাহারে বিচারের অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়। সেই অঙ্গীকার পূরণের দাবিতেই দেশ আজ উত্তাল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মানুষ যে মৌলবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তার পিছনে কাজ করেছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব। যাকে ভিত্তি করে দেশে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক চেতনা। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে উঠেছে প্রতিবাদ। এই আন্দোলনকে বানচাল করতে জামাত সেখানে লাগাতার হরতাল ডেকে, গাড়ি ভাঙচুর করে তাতে আগুন লাগিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে নেমেছে। পাশাপাশি সেখানকার গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষ জামাতকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। একই সাথে দাবি উঠেছে, বিএনপি এবং আওয়ামি লিগকে জামাতের সাথে সমস্ত রকম আঁতাত ছিন্ন করতে হবে। গণআন্দোলনের চাপ ইতিমধ্যেই বিএনপিকে বাধ্য করেছে আন্দোলনের দাবির পক্ষে সহমত হওয়ার কথা বলতে। ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগও মানুষের ক্ষোভের আঁচ বুঝে আন্দোলনের পাশে থাকার কথা বলছে। কিন্তু দু'দলই জামাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কছেদ করার ঘোষণা করেনি। আন্দোলনের ময়দান থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, জামাত এবং সরকারের বোঝাপড়ার কারণেই কাদের মোল্লাকে লঘু শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সকল দেশের বুর্জোয়া শাসকদের আজ এটাই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তারা এই ধরনের গণআন্দোলনকে বড় জোর নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু যথার্থ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে মর্যাদা দেবে না, দিতে পারে না। তা দিলে আজ বুর্জোয়াদেরই বিপদ।

বাংলাদেশের এই মৌলবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের আয়নায় ভারতের ছবি দেখলে তা আদৌ উজ্জ্বল নয়। বাংলাদেশ যখন গণহত্যাকারী মৌলবাদী নেতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, ভারতে তখন প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে আর এক গণহত্যাকারী মৌলবাদী মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদীর সমর্থনে। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে বিজেপির থেকেও এগিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস তার সরকারি ক্ষমতার জোরে সংসদ হামলায় অভিযুক্ত আফজল গুরুকে গোপনে ফাঁসি দিয়েছে ও তার পরিবারের প্রতি নির্দয় বর্বর আচরণের নজির সৃষ্টি করেছে। হিন্দুত্ববাদের এই জিগির সন্দেহ নেই এ দেশের মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলিকে অক্সিজেন দেওয়ার কাজ করবে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার যে ইতিহাসই থাক, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের বুকে মৌলবাদ এভাবে মাথাচাড়া দিতে পারত না, যদি শুধু কংগ্রেস বিজেপি বা অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলিই নয়, সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো বামপন্থী দলগুলি মৌলবাদ বিরোধী যথার্থ ভূমিকা নিত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণকে জড়িত করে ধর্মীয় মৌলবাদ ও জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করত। শুধু তাই বা কেন, সম্প্রতি দিল্লির বুকে দামিনীর গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে যখন দেশের মানুষ দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়ল তখনও একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছাড়া এই নারী নির্যাতনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

# আফগানিস্তানে প্রতিদিন মারা যায় গড়ে ১৩৩ জন শিশু

আফগানিস্তানের ৭৩ শতাংশ মানুষ পরিষ্কার পানীয় জল থেকে বঞ্চিত এবং প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষের উপযুক্ত শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ নেই। ফলে প্রতি বছর সেখানে ডায়েরিয়ার মতো পেটের অসুখে ভুগে মারা যায় ৪৮ হাজার ৫৪৫ জন শিশু। এই অবস্থা শুধু গ্রামগুলির নয়, খোদ রাজধানী কাবুলের ৭৫ শতাংশ মানুষই পরিশুদ্ধ পানীয় জল খেতে পান না। দেশের অধিকাংশ মানুষই নদী, নালা, ঝরনা, পুকুর, কুয়োর মতো উৎসগুলি থেকে অপরিশুদ্ধ জল ব্যবহার করেন, এ ছাড়া তাদের অন্য উপায় নেই। অধিকাংশ সময়ই এই জল দূষিত থাকে এবং দ্রুতগতিতে রোগ ছড়ায়। যদিও আফগানিস্তানে মাটির উপরে থাকা মাথাপিছু ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ ২৭৭৫ কিউবিক মিটার। বিশেষজ্ঞদের অভিমত সর্বমোট ১৭০০ কিউবিক মিটার জল বাৎসরিক পাওয়া গেলেই শিল্প, রান্নার কাজ, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, স্বাস্থ্য বা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন। উপর্যুপরি খরা, দুর্ভিক্ষ মানুষের জীবনকে শোচনীয় করে তুলেছে। সারা দেশে কোনও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই, প্রায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ গৃহহারা হচ্ছে। যে সমস্ত এনজিও বা বিভিন্ন দেশের সংস্থা আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের নামে সে দেশে কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের আছে বিশেষ স্বার্থ, সেটা হয় কোনও নেপথ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অথবা কোনও দেশের ধনকুবের কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ। ফলে আফগানিস্তানের শান্তি নিয়ে বারাক ওবামার চোখের জল টিভি ক্যামেরার সামনে যতই ঝরুক, যতই আমেরিকা বলুক তারা আফগানিস্তানে শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে, আফগানিস্তানের মানুষ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে ঐ শকুনরা দেশটাকে ছিবড়ে তো করেছেই এখন ঘরে বাইরে চূড়ান্ত ধিক্কৃত হয়ে তারা যখন ফিরে যাবে তখন দেশটার দখল নেবে সেই মৌলবাদী তালিবানরাই। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ মৌলবাদীদেরই শক্তি জুগিয়েছে এবং এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তিপ্রতিষ্ঠার মূল্য। মার্কিন ঈগলের থাবা আফগানিস্তানকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করে এখন নতুন শিকার খুঁজছে।

হিসাবে এবং কাপড় কাচার কাজে ব্যবহারের জন্য তা যথেষ্ট। আফগানিস্তানে মানুষের বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম উপকরণগুলিরও অভাব রয়েছে। এই সুযোগে পরিকাঠামো গড়ে তোলার অজুহাতে সে দেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। তাদের লাভের জোগান দিচ্ছে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ। তার ফলে দেশের মানুষের দুর্দশা পৌঁছেছে চরমে। বেঁচে থাকার সুযোগটুকুও যেন শেষ হয়ে গেছে। এবারের শীতেই রাজধানী কাবুল সহ সারা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে অসংখ্য শিশুর বরফে জমাট মৃতদেহ। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবস্থা শোচনীয়। ইউনাইটেড ন্যাশনাল কনসোলিডেটেড অ্যাপিল ২০১২ দেখিয়েছে প্রতি ৭ হাজার মানুষ পিছু একজন স্বাস্থ্যকর্মী আছে। দেশের বেশির ভাগ মানুষকে (৫৭.৪ শতাংশ) হাসপাতালে পৌঁছাতে হাঁটতে হয় মাইলের পর মাইল। ২৩০০০ মহিলা পিছু আছে একজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০১ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক, ৩৪৪জন ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষিকা। তালিবান এবং আফগান সরকার দুই পক্ষই দেশের শিশু কিশোরদের ব্যবহার করছে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের লড়াইতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও একই কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অপুষ্টি, বরফে জমে যাওয়া, ডায়েরিয়ায় ভুগে মরার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কারও মাথাব্যথা নেই। যদিও আফগান সরকার তাদের মদতদাতা মার্কিন বহুজাতিকগুলির বুলি আউড়েই বলছে ২০২০ সালের মধ্যে তারা সমস্ত মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তালিবানদের মধ্যযুগীয় শাসনাধীন আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলই হোক আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কবলে থাকা শহরই হোক, সর্বত্রই পানীয় জল,

*বেতন বৈষম্য বন্ধের দাবি গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের অবস্থান বিক্ষোভ (সংবাদ ২ পাতায়)*

# রাশিয়ায় স্ট্যালিন আজও শ্রদ্ধেয় নেতা

**'সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস ও স্ট্যালিনবাদ' শীর্ষক একটি সম্মেলন সম্প্রতি লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে পরিচালিত একটি সমীক্ষাকে উদ্ধৃত করে অ্যানালিটিক্যাল সেন্টারের ডাইরেক্টর লে গুডলভ বলেন, স্ট্যালিন সম্পর্কে গত ২০ বছরে রাশিয়ার সমাজচেতনা ও জনগণের অভিমতের গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমীক্ষায় দেখা গেল, রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, সোভিয়েট যুগে জে ভি স্ট্যালিনই ছিলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নেতা। গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়ার ভেতরে ও বাইরে প্রায় প্রতিদিনই অবিরাম স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা সত্ত্বেও মানুষের এই চেতনা বুঝিয়ে দেয়—সত্যকে চিরদিন চেপে রাখা যায় না।**

(নর্থস্টার কম্পাস, কানাডা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১২)

# জর্জিয়ায় জনতার উদ্যোগে স্ট্যালিনের মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

৩১ ডিসেম্বর মহান সাম্যবাদী নেতা জে ভি স্ট্যালিনের জন্মদিবসে তাঁর একটি মূর্তি আবার স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন জর্জিয়ার আবুরা অঞ্চলের জনগণ। দু'বছর আগে প্রতিবিপ্লবী গণতন্ত্রীরা এই মূর্তিটি সরিয়ে দিয়েছিল। তাতে ক্ষতিও হয়েছিল মূর্তিটির। বাদ্রি গোজিয়াশ ভিলি নামের একজন আকুরাবাসী মূর্তিটি নিজের কাছে রেখে রক্ষা করে গেছেন। চ্যানেল-২-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মূর্তিটির যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, গ্রামবাসীরা নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে তার মেরামত করেছেন। স্ট্যালিন মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

পূর্ব জর্জিয়ার আখমেতা অঞ্চলের নিকটবর্তী আলভানা গ্রামেও মহান স্ট্যালিনের আর একটি মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

# কাজের খোঁজে দেশ ছাড়ছে ইজরায়েলের বহু শিক্ষিত যুবক

প্রায় প্রতি রাতেই খাবার টেবিলে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা উঠে আসে ইজরায়েলের বিজ্ঞানী শ্রীমতী শার্লি ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের কথাবার্তায়। তাঁর বড় দুই ছেলে ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে কানাডায়। ছোটটিও হয়ত চলে যাবে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে শ্রীমতী শার্লি জানিয়েছেন, "বড় হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে, এ কথা ভেবে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাইনি। কিন্তু কী করা যাবে! এদেশে থাকলে ওরা জীবনে উন্নতি করতে পারবে না"।

শ্রীমতী শার্লির সঙ্গে ইজরায়েলের বহু মানুষই একমত। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ৩৭ শতাংশ ইজরায়েলি আগামী দিনে অন্য দেশে চলে যাওয়ার কথা ভাবছেন। এঁদের ৫৫ শতাংশই দেশ ছাড়ার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে দায়ী করেছেন। উল্লেখ করা দরকার যে, এঁরা কেউই কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের হানাদারি কিংবা আরবদের পাল্টা আঘাতের কারণে দেশ ছাড়ার কথা ভাবছেন না। ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে গাজায় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করতে সিদ্ধ হস্ত। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থাতেও তারা নাকি অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে বলে মাত্র কিছুদিন আগেই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই কাজে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সাহায্যে ইজরায়েল সরকার অকাতরে অর্থ ব্যয় করে চলেছে। অথচ যুদ্ধ বাজ এই দেশটির ভিতরের হাল কিন্তু অত্যন্ত খারাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির স্যাঙাৎ হিসাবে কুখ্যাত ইজরায়েল রীতিমতো ভুগছে আর্থিক দুর্দশায়। ২০১১-'১২-এর স্টেট অব দ্য নেশন রিপোর্ট দেখিয়েছে, গত পাঁচ বছরে ইজরায়েলের খেটে-খাওয়া পরিবারগুলির দুরবস্থা ক্রমাগত বেড়েছে। আরেকটি রিপোর্ট বলছে, সেখানে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষের ৪০ শতাংশের হাতে কোনও কাজ নেই। ২০০৯-এর তুলনায় ২০১০-এ বেকারি বেড়েছে ১১ শতাংশ, দারিদ্র বেড়েছে ২১ শতাংশ।

'অর্গানাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর সদস্য দেশ হল ইজরায়েল। তাদের করা এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, শিক্ষায় বিনিয়োগের দিক দিয়ে ইজরায়েল বেশ পিছিয়ে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগে ইজরায়েলের স্থান শেষের দিক থেকে তৃতীয়। জীবনযাত্রার মানে এই দেশ আছে ২৫তম স্থানে এবং সরকারি প্রশাসনের কার্যকারিতায় ইজরায়েল দখল করেছে শেষতম স্থান। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর অনুসৃত আর্থিক উদার নীতি। সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পিত এই নীতি দেশের অর্থনীতির পরিসংখ্যানগত উন্নতি ঘটিয়েছে, যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা, একদল বৃহৎ মালিক ও সরকারি কর্তারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভালোমন্দের দিকে কোনওরকম নজরই দেয়নি, তাদের ফেলে রেখেছে বাদের খাতায়। এই অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই কাজের খোঁজে, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে ইজরায়েলের অনেক মানুষই পাড়ি জমাচ্ছে অন্য দেশে। একই অভিমত হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সের্গিও ডেল্লাপার্গোলার। তাঁর হিসাবে শুধু ২০১১ সালেই প্রায় ১৪ হাজার ইজরায়েলি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন।

কাজের খোঁজে যাঁরা দেশ ছাড়ছেন, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। ২০১১ সালে এই মানুষগুলির বিক্ষোভেই কেঁপে উঠেছিল ইজরায়েলের রাস্তা। বোঝা গিয়েছিল, শাসকরা এঁদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ দেশের আর্থিক সংকটের বোঝা বইতে হয় এই মধ্যবিত্তদেরই। গত এক দশকে এই মানুষগুলির বেতন কমে গিয়েছে গড়ে প্রায় ৮ শতাংশ করে। এঁদের অনেককেই বিভিন্ন সংস্থার দান-খয়রাতের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হচ্ছে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতো ইজরায়েলেও ধনী-গরিবে আর্থিক বৈষম্য বিপুল। কয়েকটি পরিবারের হাতে জমা হয়েছে দেশের অধিকাংশ সম্পদ, বাকিরা পড়ে রয়েছে অন্ধকারে। এই অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঁচার পথ খুঁজতে ভিটেমাটি ছেড়ে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন ইজরায়েলের বহু মানুষ।

# বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদের দুই পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে

## নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদী-র সভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

গত ২-৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের কাঠমাণ্ডু থেকে কিছু দূরে হেড়ুয়ায় ইউনিফায়েড কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)-র ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই মতো পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও বিহার রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অরুণ সিং ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য মঞ্চে উপস্থিত নেপাল পার্টির নেতা কমরেড পুষ্পকুমার দহল, প্রধানমন্ত্রী কমরেড বাবুরাম ভট্টরাই ও সহ প্রধানমন্ত্রী কমরেড নারায়ণজী 'প্রকাশ' প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

আপনাদের দলের সপ্তম কংগ্রেসের এই মহতী উদ্বোধন সমাবেশে আমি সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিনিধিত্ব করছি। আপনাদের দেশে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রাজার স্বৈরাচারী শাসন চলছিল। এই রাজার পিছনে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, আবার বিশেষ মদত ছিল ভারতের পুঁজিবাদী সরকারেরও। কারণ ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণিও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শরিক এবং নিজেরাও প্রতিবেশী দেশগুলি সম্পর্কে সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। এহেন একটি রাজশাসনের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে আপনারা যেভাবে রাজাকে অপসারণ করেছেন, তা আমাদের হৃদয়ে এবং ভারত সহ বিশ্বের কোটি কোটি জনগণের হৃদয়ে আপনাদের বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে। আজকের সমগ্র বিশ্বে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিরই একতরফা দাপট চলছে, সেই চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নেপালের যে বীর জনগণ সশস্ত্র গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছেন, তাঁদের আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে সেলাম জানাই।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী ও উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, আপনাদের সাথে আমরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন যত চূড়ান্ত আঘাতই পেয়ে থাকুক, এটা সাময়িক হতে বাধ্য, কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক একটি অপরাজেয় দর্শন ও আদর্শ। ফলে শেষপর্যন্ত তা অপ্রতিরোধ্য।

এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে আমরা জানি, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও শিক্ষক কমরেড জে ভি স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরপরই প্রতিবিপ্লবী ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আধুনিক শোধনবাদের উত্থানই সাম্যবাদী আন্দোলনে বিপর্যয়ের মূল কারণ। এই আধুনিক সংশোধনবাদই ধীরে ধীরে সোভিয়েট ইউনিয়নে পরাজিত বুর্জোয়াদের ও ট্রটস্কিবাদী শক্তিগুলিকে মাথা তোলার ও সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এরা বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে নেয়। আমরা মনে করি, সাম্যবাদী আন্দোলনে বুর্জোয়া মতাদর্শের অনুপ্রবেশই হচ্ছে আধুনিক শোধনবাদ। একথাও মনে রাখতে হবে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে বহু পূর্বেই দ্বান্দিক চিন্তাপদ্ধতি ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক দ্বান্দিক সম্পর্কের পরিবর্তে যে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছিল, সেটিও কালক্রমে আধুনিক শোধনবাদের বিষাক্ত ধ্যানধারণার জন্মের ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করেছে। আমরা পরবর্তীতে দেখেছি, আধুনিক শোধনবাদ শুধু পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ও সর্বশেষ চীনে ও ভিয়েতনামেও ছড়িয়েছে এবং তার প্রভাব এসব দেশেও প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। একথাও অনস্বীকার্য যে, আধুনিক শোধনবাদ আবার ঐ দেশগুলির মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে তার থাবা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিস্তার করেছে এবং শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক তেজ ও দৃঢ়তাকে ধ্বংস করেছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, মহান কার্ল মার্কস প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনকে দ্রুত শক্তিশালী করতে হলে, তাকে আধুনিক শোধনবাদের ক্ষতিকর চিন্তা ও প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত কমিউনিস্টদের এটাই এখন সর্বপ্রধান দায়িত্ব।

উপস্থিত বিপ্লবী নেতা-কর্মী ও জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নির্ধারিত মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আজ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে সাহসের সাথে আপসহীন আদর্শগত সংগ্রামের সূচনা করা প্রয়োজন, কারণ একমাত্র এই পথেই আমরা আধুনিক শোধনবাদী চিন্তাকে সমূলে ধ্বংস করে কমিউনিস্ট চেতনার মানকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হব। কমিউনিস্ট চেতনার এই অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুতর বিষয়ে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের প্রিয়তম নেতা ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি শিক্ষা আপনাদের কাছে রাখতে চাই। তিনি বারবার বিশ্বের কমিউনিস্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এ কথাটা উপলব্ধি করা দরকার যে, বিশ্বে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার ও তার বিকাশের পথে অত্যন্ত বিপজ্জনক আদর্শগত বাধা হিসাবে কাজ করছে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ। ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তির স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে একাত্ম করার দ্বারাই একমাত্র এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের বিষময় প্রভাবকে নির্মূল করা সম্ভব। আমরা মনে করি, একেই আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যন্তরে সবচেয়ে জরুরি কাজ হিসাবে বিশ্বের প্রকৃত কমিউনিস্টদের গ্রহণ করা উচিত।

এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামনে রেখে আমরা মনে করি, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দুটি কাজ আমাদের করতে হবে। এক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন ও বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে, দুই) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত কমিউনিস্টদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা অনুভব করেছি যে, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও শান্তিকামী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রকৃত কমিউনিস্টদের কেন্দ্রে (কোর) রেখে যদি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তবে তা একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। প্রথমত, এটা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে কাজ করবে। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে মতবিনিময়ের উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া যাবে। এই মতবিনিময় যদি দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করা যায়, তবে তা আন্তর্জাতিক স্তরে দৃঢ় কমিউনিস্ট ঐক্য গড়ে তোলার পথ নিশ্চিতরূপে প্রশস্ত করে দেবে। আমরা যথার্থই বিশ্বাস করি, বিশ্ব পরিস্থিতির বর্তমান গুরুতর মুহূর্তে এই রণনীতিগত লাইন প্রয়োগ করার প্রশ্নে আপনাদের পার্টি ও আমাদের পার্টি যুক্তভাবে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভাষণের শেষ পর্বে কমরেড ভট্টাচার্য নেপালের ইউ সি পি এন মাওবাদী-র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, আপনারা একক প্রচেষ্টায় ও গভীর আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যে দুঃসাহসিক লড়াই চালিয়েছেন ও জয়ী হয়েছেন, তার জন্য আপনাদের বারবার অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে নতুন তেজ ও শক্তি দিয়েছে, নতুনভাবে এই আস্থা ও নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অপরাজেয়, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। একথাও সত্য যে, আপনাদের লড়াই থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, আগামী দিনেও আপনাদের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আরও শিখব। আমরা যথার্থই উপকৃত হয়েছি। আমি এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে আপনাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রতি অতীতের মতোই আমাদের সমর্থন অটুট থাকবে, আপনাদের পাশে আমরা থাকব।

ভারত সরকারকে নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত করার জন্য আমরা ভারতেও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণকে আমরা অবশ্যই সেই আন্দোলনে পাব। আপনাদের পার্টির ৭ম কংগ্রেসের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

## বাংলাদেশের আন্দোলন

চারের পাতার পর

বিরুদ্ধে একটি সর্বভারতীয় সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সিপিএম সিপিআই নেতৃত্বকে ন্যূনতম চেষ্টা করতেও দেখা গেল না। তাদের এই ভূমিকার কারণ — এদের রাজনীতিও আজ যে কোনও বুর্জোয়া দলের মতো যেকোনও উপায়ে সরকারি ক্ষমতা দখল করা অথবা সরকারি ক্ষমতার অলিন্দে থাকার রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, তাকে কীভাবে ভোটের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়, এটা এদেরও একমাত্র লক্ষ্য। এরই মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত হলেও দিল্লিতে তরুণতরুণীদের লাগাতার বিক্ষোভ প্রমাণ করে গেল— জনগণ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চায়, তরুণ প্রজন্মও এই অসহ্য পরিস্থিতিকে আজ মেনে চলতে চায় না। দরকার আজ সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সঠিক রাজনীতিকে, সঠিক দলকে শক্তিশালী করা। কারণ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ যত তীব্রই হোক, তা সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে সংগঠিত লাগাতার আন্দোলন ছাড়া সঠিক পরিণতি পেতে পারে না।

মিশরের মানুষও আজ বলছে, তারা মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো সংগঠনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। স্বৈরাচারী মুবারক শাসন বিরোধী তাদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন দাবিপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলন আশা জাগিয়ে দাবি পূরণ করতে পারেনি। ইউরোপের দেশে দেশে ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ফেটে পড়ছে। কিন্তু সংগঠিত রূপ নিয়ে লাগাতার আন্দোলনের রূপ পাচ্ছে না। এটা পেতে হলে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বের, যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বের প্রয়োজন। মিশরের জনগণ আবার রাস্তায় নেমেছে। মৌলবাদী মুসলিম ব্রাদারহুড ধর্মের বটিকা গিলিয়ে মানুষকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। তিউনেশিয়াও আবার উত্তাল। ইউরোপ আমেরিকার মানুষও ছটফট করছে। বাংলাদেশ তো এক জীবন্ত উদাহরণ হিসাবে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত। বাংলাদেশ সহ সকল দেশের সকল জনগণকেই বুঝতে হবে, তাদের ন্যায্য আন্দোলনকে সঠিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হলে আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রকৃত বিপ্লবী রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নয়ত বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী শক্তি এর ফল আত্মসাৎ করবে।

## স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার কাছে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের ডেপুটেশন

১৩ ফেব্রুয়ারি সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যভবনে ডিরেক্টর অব মেডিকেল এডুকেশন-এর (ডি এম ই) নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

অবিলম্বে স্বচ্ছ এবং বৈজ্ঞানিক বদলি নীতি চালু করা এবং সকলের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে প্রয়োগ করা, প্রতিবছর নিয়ম করে পি এস সি-র মাধ্যমে নিয়োগ করা (স্থায়ী পদে), সুপ্রিম কোর্টের অন্তবর্তীকালীন নির্দেশ মেনে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ-রাজ্যেও এম ডি /এম এস-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া এবং ২০১২ সালের এম ডি / এম এস প্রবেশিকা পরীক্ষার শূন্য ৮২টি আসনে অবিলম্বে দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানান, ডি এম ই গত বছরের ৮২টি শূন্য আসনে ভর্তি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু বাকি তিনটি দাবি পূরণে তিনি সদর্থক মনোভাব দেখাচ্ছেন না। এর ফলে এ রাজ্যের ডাক্তাররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙ্গে পড়বে। বিষয়গুলি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করেন তিনি।

# ‘আমার দেশে নারী নির্যাতনের কথা আমি সারা জীবনেও শুনিনি’

## জানালেন সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি

*(এআইএমএসএস-এর ডাকে ২৯-৩১ জানুয়ারি কেরালার ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, নেপাল ও বাংলাদেশের মহিলা প্রতিনিধিদের। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এআইএমএসএস-কে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কয়েকজন বিদেশি প্রতিনিধিকে কনফারেন্স ভিসা দেওয়া হয়নি, ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া হয়েছে, ফলে তাঁরা প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে পারবেন না। তাই২৯ জানুয়ারি কেবল সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি রি কিয়ং সিম ও নেপালের অল নেপাল উইমেনস অর্গানাইজেশন রেভলিউশনারির প্রতিনিধি সীতা পোখরেল প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত এ দেশের নারী আন্দোলনের হাজার হাজার সৈনিকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন তাঁদের সংগ্রামের বার্তা, বাকিরা পারেননি। শুধু তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রিত এক প্রতিনিধির ভিসা পর্যন্ত আটকে দিয়েছে প্রশাসন। পরে প্রতিনিধি অধিবেশনের মাঝে ৩০ জানুয়ারি আয়োজিত হয়েছিল বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে কথোপকথনের সভা। সেখানে আমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই প্রতিনিধিদের নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এখানে সেইসব প্রশ্নের কয়েকটি বেছে নিয়ে উত্তরগুলি প্রকাশ করা হল।)*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির প্রতিনিধি কমরেড লিল্যানি ডাওয়েল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ‘আপনার পার্টি ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলনে কীভাবে অংশ নিচ্ছে? এই আন্দোলনের নেতৃত্বে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক শক্তিকে দেখা যাচ্ছে না, এ রকম হলে কিছুদিন চলার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। আমেরিকার ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন?’ উত্তরে তিনি বলেন, এই আন্দোলনে সত্যিই কোনও বিপ্লবী নেতৃত্ব সামনে নেই। আমাদের দল ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি আন্দোলনের মধ্যে থেকে সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলার চেষ্টা করেছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এটাই যে, অকুপাই আন্দোলনেই প্রথম আমেরিকার মাটিতে পুঁজিবাদ বিরোধিতার কথা শোনা যাচ্ছে। আমেরিকার মানুষ যেন বুঝতে পারছে পুঁজিবাদের স্বরূপ, তারা তা থেকে মুক্তি চাইছে।



*লিল্যানি ডাওয়েল*

কথোপকথনের সভায় স্বভাবতই বেশির ভাগ প্রশ্ন ছিল সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া (ডিপিআরকে)-এর দুই প্রতিনিধি কমরেডস রি কিয়ং সিম এবং রিউ কুম র্যানের উদ্দেশে। প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করেন, ‘নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য ডিপিআরকে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে’? উত্তরে তাঁরা বলেন, ‘সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ায় নারীর মর্যাদার বিষয়টি শুধু একটি রাষ্ট্রীয় নীতিই নয়, আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই এটা আছে। মহিলাদের অধিকার আমাদের দেশে সুরক্ষিত। ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়া সেখানে মানুষের পূর্ণ বিকাশের দিকে নজর দেয়, শুধু পুরুষদের নয়, মহিলাদেরও। পুরুষরা কখনও মনে করে না যে সমাজে মেয়েদের স্থান নিচে। পুরুষ-নারী উভয়েই সেখানে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য’। এক প্রতিনিধি বলেন, ‘মহিলাদের সম্পর্কে আমাদের দেশে এক প্রখ্যাত লেখকের লেখা একটি গান খুব জনপ্রিয়। সেখানে বলা হয়েছে, পরিবারে ও সমাজে নারী হল ফুলের মতো। সন্তান পুত্র না কন্যা, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না উত্তর কোরিয়ায়। নিজের জীবনের ওপর মহিলাদের যাতে পুরো মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ থাকে, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন নজর রাখা হয় আমাদের দেশে। বলা হয়, সমাজ-রথের দুটি চাকা — একটি পুরুষ একটি নারী। ফলে উত্তর কোরিয়ায় নারীর অবস্থান খুবই মর্যাদাময়।’ তিনি বলেন, ‘আমি আমার জীবনে কোনও মহিলার ওপর অত্যাচারের কথা একবারের জন্যও শুনিনি’। ডিপিআরকের প্রতিনিধিরা বলেন, ‘আমাদের দেশ জাপানি সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিল। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতার পর লিঙ্গ-সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর কোরিয়ায়, তৈরি হয় নারী সংগঠন। মহিলারা আমাদের দেশে সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলিতেও যোগ দিতে পারেন’।

প্রশ্ন করা হয়, ‘সমাজতান্ত্রিক চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখতে উত্তর কোরিয়ায় কী ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়?’

উত্তরে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি বলেন, ‘সমাজতান্ত্রিক কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট রাখতে আমরা কাজ করি। প্রযুক্তি, শিক্ষা, সমর বিভাগ সহ যে ক্ষেত্রেই আমরা কাজ করি না কেন, সর্বত্রই আমাদের লক্ষ্য থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের দেশে রয়েছে কোরিয়ান ডেমোক্রেটিক উইমেনস ইউনিয়ন। এই সংগঠন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম পরিচালনা করে। কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় এবং অন্য সর্বত্র কর্মরত মহিলাদের এই সংগঠন দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। যে সমস্ত মহিলারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ছে, আমরা সবসময়ই তাদের পাশে দাঁড়াই।’



MUNDO OBRERO • Prisiones secretas • Huelga de hambre

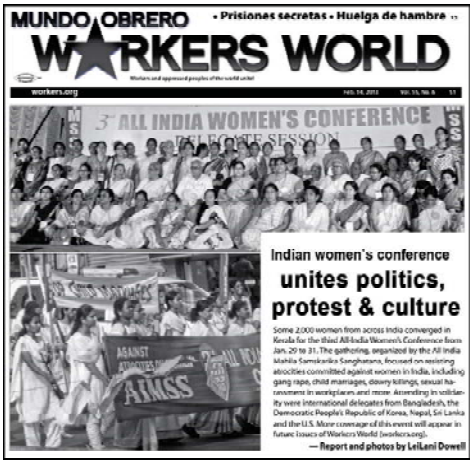

WORKERS WORLD

workers.org

Indian women's conference

unites politics, protest & culture

Some 2,000 women from across India converged in Kerala for the third All-India Women's Conference from Jan. 29 to 31. The gathering, organized by the All India Mahila Samskarika Sanghatana, focused on resisting atrocities committed against women in India, including gang rape, child marriages, dowry killings, sexual harassment in workplaces and more. Attending in solidarity were international delegates from Bangladesh, the Democratic People's Republic of Korea, Nepal, Sri Lanka and the U.S. More coverage of this event will appear in future issues of Workers World (workers.org).

— Report and photos by LeiLani Dowell



*আমেরিকার ‘ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড’ পার্টির পত্রিকায় প্রকাশিত খবর*

উত্তর কোরিয়ার প্রচারমাধ্যম সম্পর্কে প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তাঁরা বলেন, ‘উত্তর কোরিয়ায় প্রেস ও মিডিয়ার স্বাধীনতা আছে। আমাদের দেশ গঠনে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগেও নিয়েছেন, এখনও নিয়ে থাকেন। প্রচারমাধ্যম দেখায়, উত্তর কোরিয়ায় মহিলারা কেমন ভাবে দেশ গঠনে ও পরিবার প্রতিপালনে অংশ নিচ্ছেন। পত্রিকাগুলিতেও মহিলাদের নানা ভূমিকার কথা ছাপা হয়। অত্যন্ত স্বাধীনতার সঙ্গে প্রচারমাধ্যম আমাদের দেশে মহিলাদের সম্পর্কে ও তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে নানা বিষয় প্রচার করে’।

উপস্থিত সংগঠকরা প্রশ্ন করেন, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও দেশের জন্য কাজ — উত্তর কোরিয়ার মহিলাদের কাছে কোনটি বেশি গুরুত্ব পায়?



*রি কিয়ং সিম*

উত্তরে ডিপিআরকে-র প্রতিনিধি বলেন, ‘মহিলাদের দুটি দায়িত্বই পালন করতে হয়। নারী যেহেতু সমাজেরই একজন মানুষ, তাই শুধুমাত্র ঘরোয়া কাজকর্ম করেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, দেশের জন্য কাজের মধ্য দিয়েই আসে তার সম্পূর্ণতা। সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ না করে সে থাকতে পারে না, সুখী জীবন যাপন করতে পারে না। আমাদের দেশে মহিলাদের পারিবারিক শ্রমের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে অনেক কিন্ডারগার্টেন এবং স্কুল আছে যেখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর খরচ নিয়ে পরিবারগুলিকে মাথা ঘামাতে হয় না। ফলে নিশ্চিন্তমনেই একজন মহিলা আনন্দের সঙ্গে সমাজ প্রগতির জন্য কাজ করতে পারে, সাথে সাথে মা হিসাবে নিজের দায়িত্বও পালন করতে পারে। আমি মনে করি, পরিবারে নিজের ভূমিকার থেকেও একজন নারীর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সমাজের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বিষয়টি। তার এই সামাজিক ভূমিকাটির সর্বদা পৃষ্ঠপোষকতা করে কোরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি এবং সে দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাই আমাদের দেশে মহিলারা সমাজ অগ্রগতির জন্য আরও বেশি ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত’।

উত্তর কোরিয়ায় পরিবারগুলির গঠন কেমন — এ প্রশ্ন করা হলে এক প্রতিনিধি বলেন, ‘বোঝার সুবিধার জন্য আমার উদাহরণই দিই। আমার স্বামী তাঁর মা-বাবার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। তাই আমি, আমার স্বামী ও সন্তানরা আমার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকি। আমাদের দেশে নৈতিকতার দিক দিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকাটাকেই উচিত বলে মনে করা হয়। আমরা বয়স্ক মানুষদের শ্রদ্ধার চোখে দেখি। ফলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে কেউ বোঝা বলে মনে করে না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে কাজে সাহায্য করেন এবং আমিও আন্তরিক ভাবে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। এভাবেই আমাদের দেশে পরিবারগুলি তৈরি হয়।’

— ‘উত্তর কোরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা কেমন?’

প্রতিনিধিরা বলেন, ‘আমাদের দেশে ১১ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা রয়েছে। এর পুরোটাই দেওয়া হয় বিনামূল্যে। উত্তর কোরিয়ায় চিকিৎসার জন্যও অর্থ ব্যয় করতে হয় না। নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য কোনও পয়সা লাগে না। নার্সারি ও মিডল স্কুল স্তর পাশ করার পর সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়।’



*সীতা পোখরেল*

নেপালের প্রতিনিধি সীতা পোখরেলকে প্রশ্ন করা হয়, ‘নেপালে মহিলাদের অবস্থা কীরকম? তাঁরা কি বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশ নিচ্ছেন?’ উত্তরে তিনি জানান, ‘২০০৬ সাল থেকে নেপালে মহিলারা বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে লড়ছেন। আমাদের দল দেশের রাজনীতির মূল স্রোতে চলে আসা সত্ত্বেও এখনও তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নেপালে এখনও পুঁজিবাদ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানে সামন্তী মানসিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। সাথে সাথে মহিলারা রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিচ্ছেন।’



**জান্নাতুন ফিরদৌস**

বাংলাদেশের দুই প্রতিনিধি পারভিন আখতার ও জান্নাতুন ফিরদৌসকে প্রশ্ন করা হয়, ‘ভারতের মতো বাংলাদেশেও কি অনার কিলিং প্রচলিত আছে?’ উত্তরে তাঁরা জানান, বাংলাদেশেও অনার কিলিংয়ের ঘটনা ঘটে। সেখানে একে বলা হয় ফতোয়া। সেখানে মেয়েদের প্রতিনিয়ত ফতোয়ার শিকার হতে হয়। বহু মেয়েকে প্রাণ দিতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট ফতোয়া বন্ধ হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছে, কিন্তু সরকার তার সঙ্গে একমত নয়, ফলে তারা ফতোয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। সোস্যালিস্ট উইমেন ফোরামের পক্ষ থেকে ফতোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলে প্রতিনিধিরা জানান এবং বলেন যে তাঁরা ফতোয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পক্ষে গণসমর্থন সংগ্রহ করার কাজ চালাচ্ছেন।

**গণদাবীর লেখা সম্পর্কে মতামত পাঠান**

মতামত ও খবর পাঠানোর ঠিকানা ঃ

**৮এ ক্রিক লেন, কলকাতা - ১৪**

ফোন ঃ (০৩৩)২২৬৫০২৭৬, ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৮৩৬০৫৪৪১০, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015



# সরকার নির্ধারিত মজুরির ৭১ শতাংশই পান না কোচবিহারের বিড়ি শ্রমিকরা

মালিক-ঠিকাদার-এজেন্টদের দ্বারা বিড়ি শ্রমিকরা চূড়ান্ত শোষণের শিকার। প্রতি হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য কোচবিহারে সরকার নির্ধারিত মজুরি ১৫৮.২২ টাকা। কিন্তু কোনও মালিকই এই মজুরি দেয় না। তাদের দেওয়া হয় মাত্র ৪৫-৫০ টাকা। সরকারের শ্রম দপ্তর এই বেতন বঞ্চনার অপরাধে মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না বা শ্রমিকদের মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে না। ফলে বঞ্চনা অব্যাহত। শুধু বেতন বঞ্চনাই নয়, বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদানেও রয়েছে চূড়ান্ত অনীহা। পরিচয়পত্র দিলে শ্রমিকরা আইনত যে অধিকার পায় তা থেকে বঞ্চিত করতেই এই গড়িমসি। কোচবিহার জেলা সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের হিসাবে প্রায় ২৫ হাজার বিড়ি শ্রমিক পরিচয়পত্র থেকে বঞ্চিত। এই পরিচয়পত্র দেওয়া নিয়ে চলছে চূড়ান্ত হয়রানি ও ঘুষের কারবার। সমস্যা এখানেই শেষ নয়। আইনানুযায়ী বিড়ি শ্রমিক পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি, গৃহনির্মাণ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও মৃত্যুকালীন যে ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা নামমাত্র। তাছাড়া আবেদনের পর ২৪/২৫ মাস কেটে গেলেও বহুক্ষেত্রে তা মঞ্জুর হয় না। উল্লিখিত ভাতা তিনগুণ বৃদ্ধি এবং আবেদনের তিন মাসের মধ্যে প্রদান এবং নির্ধারিত মজুরি দেওয়া সহ ৯ দফা দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি দুই শতাধিক বিড়িশ্রমিক জেলা শ্রম আধিকারিক ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেয়। শহরের কাছারি মোড়ের এক সমাবেশে ইউনিয়নের জেলা সভাপতি কমরেড নৃপেন কার্যী বলেন, সিপিএম সরকারের আমলে বিড়ি শ্রমিকরা যেভাবে বঞ্চিত হতেন, সেই ধারাই অব্যাহত রয়েছে বর্তমান তৃণমূল সরকারের শাসনে। বক্তব্য রাখেন কমরেড পূর্ণ মণ্ডল।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এই সংগঠনটি শ্রমিক স্বার্থে ডাকা ২০-২১ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে শহরে মিছিল করে।

# মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্মেলন

১০ ফেব্রুয়ারি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পঞ্চম কলকাতা জেলা সম্মেলন। প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলার দুই শতাধিক ডাক্তার-নার্স-ডাক্তারি ছাত্র, শিক্ষক এবং প্যারামেডিকেল স্টাফ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), মেডিকেল-প্যারা মেডিকেল-নার্সিং শিক্ষার বেসরকারিকরণের রূপরেখা। ভিশন-২০১৫ প্রতিরোধে এবং মেডিকেল এথিক্সের মহান আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অধ্যাপক ডাঃ অসীম রায়চৌধুরীকে সভাপতি এবং ডাঃ বিপ্লব চন্দকে সম্পাদক করে মোট ১০৭ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। গত ৫০ বছর ধরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা কোন পথে চলছে, কী ধরনের পরিবর্তন আসছে তার জনবিরোধী দিকগুলি আলোচনায় তুলে ধরেন অধ্যাপক ডাঃ অভিজিৎ তরফদার, অধ্যাপক বিশ্বপতি মুখার্জী, ডাঃ অশোক সামন্ত এবং ডাঃ অনুপ মাইতি।

# ওড়িশা রাজ্য যুব শিবির

ঘাটশিলায় মার্কসবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে ৯-১১ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও-র ওড়িশা রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে যুবশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি রক্তপতাকা উত্তোলন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শিবির উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস। কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত 'মার্কসবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' — পুস্তিকাটির উপর আলোচনা চলে তিন দিনের এই শিবিরে। শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি)'র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। কেন আজকের যুবসমাজ মার্কসবাদকে তাদের জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ করবে, অন্যান্য দর্শনের চেয়ে মার্কসবাদ কেন উন্নত, কেন মার্কসবাদ সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং সমাজ পরিবর্তনের দর্শন তা বিশদে আলোচনা করেন তিনি। কমরেডস বি আর মঞ্জুনাথ, মহিউদ্দিন মান্নান, নিরাকার পাণ্ডব, রাজেন্দ্র ভার্মা সহ যুব নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন গ্রুপ বৈঠক পরিচালনা করেন। শিবিরে আলোচনা ছাড়াও নানা ধরনের খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

*ওড়িশা রাজ্য যুব শিবিরে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী।*

# শিক্ষার বিভিন্ন দাবিতে সেভ এডুকেশন কমিটির অবস্থান

১২ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের দুটি পৃথক জমায়েত থেকে রাজ্যের শিক্ষক অধ্যাপক, শিক্ষাবিদরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে এই অবস্থান বিক্ষোভ অয়োজিত হয়েছিল। কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল তাঁর বক্তব্যে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সর্বনাশা পরিণাম ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপিকা চৈতালী দত্ত শিক্ষার অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে দেখান এই আইন শিক্ষার অধিকারই হরণ করবে। সমাবেশে স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষা ও লটারির মাধ্যমে ছাত্রভর্তির প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি ওঠে। শিক্ষক নেতা তপন রায়চৌধুরী, ছাত্র নেতা সৌরভ মুখার্জী সহ কমিটির বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনের জমায়েতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও নীতির পরিবর্তন হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল। বর্তমান সরকার তুলে দিচ্ছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তিনি বলেন, এর ফলে প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক শিক্ষারও বেসরকারিকরণ ঘটবে। শিক্ষক নেতা রতন লস্কর স্কুলে যৌন শিক্ষা প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অজিত রায়, অধ্যাপক প্রদীপ মণ্ডল। শিক্ষক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য, অসিত দে, দেবাশীষ সাহা, বিশ্বনাথ ঝা, অধ্যাপক বিকাশ দেব, অধ্যাপক দীপক সাহা, অধ্যাপক মানস জানা, অধ্যাপক মনোতোষ প্রামাণিক সহ শত শত শিক্ষানুরাগী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

# গার্ডেনরিচে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ডি এস ও-র বিক্ষোভ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবং সন্ত্রাসের অজুহাতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায়, সভাপতি কমরেড সুজিত ঘোষ সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক বলেন, গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। দীর্ঘদিন সিপিএম যেভাবে কলেজে কলেজে দুষ্কৃতীদের নামিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, বর্তমানে টিএমসিপি-ও একই কায়দায় কলেজে ছাত্র সংসদ দখলের মহড়া দিচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন যেখানে ছাত্রদের কাছে একমাত্র অবলম্বন, সেখানে আন্দোলন ভাঙতে লিংডো কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার চক্রান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি আমরা।

## কর্মসংস্থানের দাবিতে যুব সম্মেলন

সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ ও বেকারের কাজের দাবিতে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ, অপসংস্কৃতির প্রসার ও মদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে ৯ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও-র কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় ঝঙ্কার ক্লাবে। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সম্পাদক, সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে কমরেডস লক্ষণ রায়, সুদন পাল ও বিকাশ বর্মন। সম্মেলন শেষে যুবকদের এক সুসজ্জিত মিছিল মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in